মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, মে ২০২৫

আউটরিচ কর্মসূচি | তারুণ্যের পদচারণায় মুখর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

‘আজকে আমি ২য় বারের মতো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসেছি। ১ম বার এসেছিলাম স্কুল থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়বার সময়। তখন জাদুঘরটি ছিল সেগুনবাগিচায়। আগারগাঁওয়ে এবারই প্রথম এলাম। তখন আমিও ছোট ছিলাম সেগুনবাগিচার জাদুঘরটিও ছোট ছিল। এখন আমিও বড় হয়েছি জাদুঘরটিও অনেক বড় হয়েছে আগের চেয়ে।’ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আউটরিচ কর্মসূচিতে আগত ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের মিথিলা ফারজানাসহ কতক শিক্ষার্থীর সাথে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে তরুণ প্রজন্মের জাদুঘর পরিদর্শনের নানারকমের গল্প।

দর্শণার্থীদের পদচারণায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ইট-পাথরের অবকাঠামোও যেন প্রাণ ফিরে পায়। আর এই দর্শণার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগই তরুণ প্রজন্মের এবং তাদের অধিকাংশই শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম আউটরিচ কর্মসূচি। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালনা করা হয় এই কর্মসূচি।

আরেক জন ক্ষুদে শিক্ষার্থী জানায়– ‘আমি নিশাত তাসনীম, শহীদ আনোয়ার গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। আমি প্রথম বারের মতো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসেছি। আমরা পাঠ্য বইতে পড়েছি ঠিকই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এতো ডিটেলসে জানতাম না। এখানে এতো এতো ছবি দেখতে পেলাম মুক্তিযুদ্ধের। একবারে সব কিছু মন মতো দেখতেও পেলাম না। আমি চাই আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে আবার ঘুরতে আসতে।’

গত এপ্রিল-মে মাসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫০ জন, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের ১৮ জন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ৬০০ জন, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ৫৩ জন, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ৩৬২ জন এবং শহীদ আনোয়ার গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ইফাত আরা মুনা জানায়– ‘জাদুঘরে ঢুকে প্রথমে

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিষ্ঠুরতার স্মৃতির পরম্পরা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে গত ৮ মে ২০২৫, মিরপুরস্থ প্রাইম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দশম শ্রেণির ২১ জন শিক্ষার্থী জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করে। জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শনে শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তাই নতুন প্রজন্মকে একাত্তরের গণহত্যার ইতিহাস জানানো, শহীদ পরিবারের স্মৃতিকথা শোনা এবং সমগ্র বাংলাদেশের অসংখ্য বধ্যভূমির ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সাপ্তাহিক এই কর্মসূচির শুরুতেই সকল শিক্ষার্থী প্রথমে জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করে। পরিদর্শন কালে জল্লাদখানায় গণহত্যার ইতিহাস, খনন কাজ, সংগৃহীত বিভিন্ন বধ্যভূমির মাটি, স্থাপত্য নকশায় এর নির্মাণশৈলী এবং বিশ শতকে বিভিন্ন দেশে সংঘটিত গণহত্যা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়। পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে সবুজ ঘাসে আবৃত চত্বরে বসে শোনে একাত্তরের শহীদ ইয়ার আলীর সন্তান মো: শাহজামাল-এর স্মৃতিচারণ। তিনি বলেন ‘মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল সাত বছর। আমার বাবা মো: ইয়ার আলী এবং চাচা মো: পিয়ার আলী ছিলেন মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনের বাসিন্দা। এলাকার সমাজসেবামূলক কাজে সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন।

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত কর্মশালা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি একটি সংস্কৃতিবান্ধব, বইবান্ধব সমাজ গঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যেমন সম্পৃক্ত হচ্ছে, তেমনি সম্পৃক্ত হচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে বেসরকারি গ্রন্থাগার এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি তাদের এই আয়োজনের সাথে যুক্ত করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে। বিগত কয়েকবারের ধারাবাহিকতায় ৭ মে ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের যৌথ আয়োজনে বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের জন্য আয়োজিত হলো 'মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজ বিকাশে বেসরকারি গ্রন্থাগারের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তৃতীয় দিন এই বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ৭১টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের নিয়ে। শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম সকলকে স্বাগত জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গড়ে ওঠার দিনগুলোর কথা বলেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, আর আজ যে পাঠাগারগুলো কর্মশালায় অংশ নিচ্ছে তারাও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে অনেক বাধা অতিক্রম করেও বড় কিছু করা সম্ভব তার উদাহরণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং দেশব্যাপী গড়ে ওঠা বেসরকারি গ্রন্থাগার উদ্যোগ। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক আফসানা বেগম বলেন, দেশে পাঠক তৈরির মূল কাজটি বেসরকারি পাঠাগারগুলোই করে থাকে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করে, সহায়তা দেবার চেষ্টা করে। তিনি বলেন পাঠাগারগুলোকে কেবল পাঠক তৈরি করলে হবে না পাঠককে ধরে রাখতে হবে। পাঠক কি ধরণের বই পড়ে সেটি জানতে হবে, সেই অনুসারে বই সংগ্রহ করতে হবে। বিভিন্ন বেসরকারি পাঠাগার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, হয়তো একটি ছোট্ট পাঠাগার কিন্তু সেখানে নিয়মিত পাঠক আসছে, নানান সৃজনশীল কর্মকাণ্ড হচ্ছে। ভবিষ্যতে যেসকল পাঠাগার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহায়তা তাদের জন্য বৃদ্ধি করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পাঠাগার প্রতিনিধিরা তাদের নানান প্রতিবন্ধকতার কথা তুলে ধরেন। ট্রাস্টি মফিদুল হক বাংলাদেশের শত বছরের বেসরকারি গ্রন্থাগারের ইতিহাস এবং স্বাধীন দেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলোর আবার ঘুরে দাঁড়ানোর কথা শোনান। তিনি মনে করেন, সমাজের শক্তি এবং তার সাথে সরকারের সহায়ক নীতি এবং সহায়তা এই সংযোগই পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আমাদের দেশে যেভাবেই হোক সামাজিক শক্তিটা অনেকভাবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো, মুক্তিযুদ্ধে সামাজিক শক্তিই সবচাইতে বেশি সক্রিয় ছিল। গ্রন্থাগারিকরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের সম্মিলিত প্রয়াসেই অনেক কিছু করতে পারেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন। গ্রন্থাগারগুলোর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন বিদ্যালয়ের মতো পাঠাগুলোরও একটি কম্পিউটার ল্যাব থাকা প্রয়োজন। তাতে পাঠকরা আরো বেশি মানসম্মত পাঠ উপকরণ সহজে পাবেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ' এবং ' সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ' বিষয়েও তিনি সকলকে অবহিত করেন। গ্রন্থাগারিকবৃন্দ দলীয় কাজের অংশ হিসেবে আগামী তিন মাসে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, জাদুঘরের সাথে তাদের যে সংযোগ তৈরি হয়েছে ভবিষ্যতে তা অব্যাহত থাকবে এবং ক্রমে দৃঢ় হবে।

১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস
বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের স্মৃতি

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলা আমবাগানে প্রথম বাংলাদেশ সরকার শপথগ্রহণ করে। পাকিস্তানীদের অনাহুত আক্রমণ এড়াতে কঠিন গোপনীয়তায় শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান-টি আয়োজন করা হয়। সেখানে বিদেশের সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মী ও স্থানীয় সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে শপথগ্রহণ করেন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, এম এ জি ওসমানীসহ অন্যরা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমন দু'জন মুক্তিযোদ্ধা– ডা. মো: মোজাহারউল হান্নান এবং কামালউজ্জামান-এর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের স্মৃতি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কামালউজ্জামান

'১৭ এপ্রিল ভোরে আমরা বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে পৌঁছাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি সেখানে সেদিন মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করবে। আমদের সৌভাগ্য হয়েছিল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেও-য়ার। পরবর্তীতে সেখান থেকে আমরা ভারতের বেতাই ক্যাম্পে যোগদান করি।'

বীর মুক্তিযোদ্ধা
ডা. মো. মোজাহারউল হান্নান

'বেলা আড়াইটা তিনটার দিকে দেখি সেখানে বিরাট স্টেজ হয়েছে। তখন তারা গাড়িতে করে ইন্ডিয়া থেকে আসলেন ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে। তখন বুঝতে পারলাম শেখ মুজিব না, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এরা এসেছেন। সেখানে সবাই শপথ নিলেন। আমরা সেই শপথ নেওয়া অনুষ্ঠানটা দেখলাম। ঘন্টা খানিকের অনুষ্ঠান শেষে তারা চলে গেলেন। আমরাও ফিরে আসলাম। কিছু দিন পর আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম।'

মুক্তিযোদ্ধা ডা. মো. মোজাহারউল হান্নান জন্মগ্রহণ করেছেন মেহেরপুরের আমঝুপিতে। ১৯৭১ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের নবীন ডাক্তার হিসেবে কর্মরত ছিলেন আর মুক্তিযোদ্ধা কামালউজ্জামান ঝিনাইদহ কেশবচন্দ্র কলেজের শিক্ষার্থী এবং ছিলেন কলেজের ছাত্র সংসদের যুগ্মসম্পাদক। ১৯ বছর বয়সী কামালউজ্জামানের সামনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এবং জাতির ৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্মারক সংগ্রহের বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা

মানুষ প্রতিটি পদক্ষেপেই অভিজ্ঞতাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে যায়। উঁই রেনু রেনু চয়নে, জীবনের শেষ গন্তব্যে, অভিজ্ঞতার এক পাহাড় গড়ে উঠে। কিশোরগঞ্জ আমার জন্ম। বাবা দেশের প্রখ্যাত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ও লোক-ঐতিহ্য সংগ্রাহক এবং গবেষক মোহাম্মদ সাইদুর। আমার বাবার অনুসন্ধিৎসু পদচারণা আমাকে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ ও গবেষণার এক গুচ্ছ শুভ্র প্রসূন উপহার দিয়েছে। ছোট বেলা থেকে আজ অবধি কত স্মৃতিই না মনে পড়ে, কত স্মৃতি হারিয়ে গেছে। শহীদ পরিবারের মর্মান্তিক আত্মদানের করুন কাহিনী শুনেছি। বিভিন্ন স্মারক সংগ্রহের জন্য ছোট বেলা থেকেই আমি বাবার সঙ্গে বিভিন্ন এলাকাতে যেতাম। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে প্রচুর স্মারক সংগ্রহ করেছেন আমার বাবা মোহাম্মদ সাইদুর। তিনি জীবনের ইতি টানেন ২০০৭ সালের ৪ মার্চ।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালীদের উপর হত্যা চালানো হয়, সেই হত্যার প্রতিবাদে সিলেট শহরের মিছিলের আলোকচিত্র *দাতা: ইকবাল সিদ্দিকী*

১৪ মার্চ ২০০৭ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বাবার স্মরণ সভা শেষে ট্রাস্টি মফিদুল হক আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, "হারেছ তুমি কি পারবা সাইদুর ভাই-এর মতো স্মারক সংগ্রহ করতে ?" আমি ভয় পেয়ে গেলাম, আমেনা আপা বললো মফিদুল ভাই সে পারবে কারণ সাইদুর ভাইয়ের সঙ্গে স্মারক সংগ্রহ করতে সে বিভিন্ন অঞ্চলে যেত এবং প্রায় সময়ই সে তার বাবার সাথে থাকতো। বাবার সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় ঘোরার সুবাদে আমার মত একজন সাধারণ মানুষ ২০০৭ সালে এপ্রিল মাস হতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্মারক সংগ্রাহক হিসাবে যুক্ত হলাম। জাদুঘরের ট্রাস্টিদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। পৃথিবীর সব দেশেই এখন ইতিহাস ঐতিহ্য ও প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন বা স্মারক নিয়ে নিজের অতীত গৌরবকে তুলে ধরার প্রয়াস চলছে। এরই ধারাবাহিকতা বাংলা ও বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ও নিদর্শন সংগ্রহ করার (আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতি মাসেই কিছু না কিছু) চেষ্টা করি। স্মারক সংগ্রহের কোন অসুবিধা হলে জাদুঘর থেকে আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়।

যে কোন জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং নিদর্শন/স্মারক যুগের দর্পন স্বরূপ। এগুলো কালের জীবন্ত সাক্ষি। এর কোন মৃত্যু নেই। এর মাধ্যমে জাতি, গোষ্ঠ, সম্প্রদায় অতীতকে দেখতে পায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নিদর্শন/স্মারক সংগ্রহের পেছনে প্রায় ১৯ বছর কাটিয়ে দিয়েছি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এনেছি শত শত গুরুত্বপূর্ণ স্মারক। এর মধ্যে কয়েকটি স্মারকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো–

১৯৭১-এর শহীদ শিল্পী কুদরত-ই-এলাহীর আঁকা ছবি এবং অন্যান্য স্মৃতিস্মারক, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কতৃক নির্যাতিত নারীর আলোকচিত্র, রাজাকারদের কর্মকাণ্ডের দলিলপত্র।

১৯৭১-এর শহীদ জিকরুল হক এমপির ব্যবহৃত কোট ও তার লেখা কবিতা এবং বিভিন্ন স্মারক।

১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিনের কাছ থেকে সংগ্রহ করা প্রাচীন তালা (ওয়ারী বটেশ্বর থেকে সংগৃহীত)।

৬ নম্বর সেক্টরের উইং কমান্ডার খাদিমুল বাসারের হেড কোয়াটারে ব্যবহৃত একটি চেয়ার ও টেবিল (বুড়িমারী হাসরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় হতে সংগৃহীত), ১৯৭১ সালে পাক সেনারা কিশোরীদেরকে ধরে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে একজন নির্যাতিতা কিশোরীর ছবি।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর যে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় তার প্রতিবাদে সিলেট শহরে মিছিলের ছবি।

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে এবং মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগকে জাতির সামনে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসে এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। মুক্তিযুদ্ধের পরে আমার জন্ম তাই যখন মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হাতে পাই সেটা আমাকে প্রাণিত করে এবং মুক্তিযুদ্ধই আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায় দিবানিশি।

হারেছ উজ জামান
স্মারক সংগ্রাহক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

তারুণ্যের পদচারণায় মুখর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

১-এর পৃষ্ঠার পর

আমি থমকে গিয়েছিলাম। চারপাশে মনে হচ্ছে ইতিহাস কথা বলছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, শহিদদের ছবি, তাদের রক্ত মাখা কাপড়, তাদের চিঠি এসব দেখে আমি অভিভূত। চারটি গ্যালারিতে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে ৫২ ভাষা আন্দোলন, ৭ মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চের কালরাত্রি এরকম প্রত্যেকটি বিষয় বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি কতোটা ত্যাগ এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা।'

গত ৩ ও ৪ মে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিও-ভিজ্যুয়াল টিম আগত এসকল শিক্ষর্থীদের সাথে সময় কাটায়। এসময় আমরা ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগ এবং শহীদ আনোয়ার গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণির বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলি। এসব কথোপকথনে প্রতিফলিত হয়েছে তারুণ্যের মুক্তিযুদ্ধ ভাবনা, আউটরিচ কর্মসূচি ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সম্পর্কিত নানা অভিব্যক্তি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান জানায়– 'আমি ঢাকাতেই বড় হয়েছি। অনেক দিন ধরেই ইচ্ছা ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসবো। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে আসি আসি করেও আসা হয়নি এতো দিন। আজকে আমার ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে এই সুযোগটা সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের শিক্ষক ও ক্লাসমেটদের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি ঘুরে দেখছি। জানতে পারছি কতোটা আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশটি পেয়েছি। এখানে না আসলে আমার কাছে ইতিহাসটা অস্পষ্ট থেকে যেতো।'

গ্যালারি পরিদর্শন শেষ হলেও তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়ে উঠে। মুক্তিযুদ্ধ নতুন রূপে ধরা দেয় তাদের কাছে। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে সকল বিভাগের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস'। এই বিষয়ে জানতে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন আরও বেশি সুযোগ তৈরি কর দেয় তাদের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করতে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকে আউটরিচ কর্মসূচির মাধ্যমে। চারটি গ্যালারি পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা একটি কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। কুইজ বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের বই।

স্কুল শিক্ষার্থী নুশরিকা ফেরদৌস অপ্সরা জানায়– 'এখানে এসে আমি বইয়ে যা আছে তার থেকে অনেক বেশি কিছু জানতে পেরেছি। গ্যালারিতে শরণার্থী শিবিরের আলোকচিত্র আমাকে খুবই ভাবিয়েছে। শরণার্থীদের দুর্বিসহ জীবন দেখে আমার কষ্ট লেগেছ। আমারই বয়সের শিশুরা যুদ্ধের শিকার হয়ে কতো মানবেতর জীবনযাপন করেছে। আমি খালি দেখেছি আর ভেবেছি। এখন তো আমরা কতো ভালো জীবন যাপনের সুযোগ পাচ্ছি। তারা সেসময় কষ্ট না করলে আজকে আমরা এই জায়গায় থাকতে পারতাম না। আমরা যেন আমাদের এসব ইতিহাস ভুলে না গিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা যেন আমাদের ইতিহাস স্মরণ করি।'

উল্লেখ্য ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যাত্রা শুরু করে এই আউটরিচ কর্মসূচি নিয়মিত ভাবে চলে আসছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায় সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অবহিত করার মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আউটরিচ কর্মসূচি।

ইয়াসমিন লিসা, গ্যালারি গাইড
শরীফ রেজা মাহমুদ, অডিও-ভিজ্যুয়াল কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র কর্তৃক

যশোর-খুলনায় মুক্তিযোদ্ধা সাক্ষাৎকার সংগ্রহ

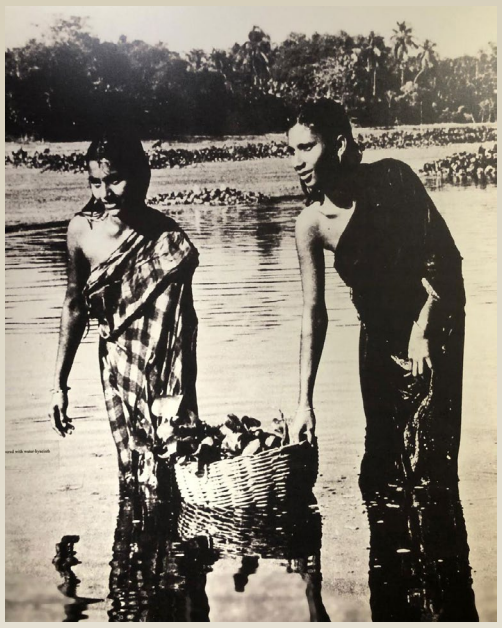

’৭১-এর আলোকচিত্রে জমিলা খাতুন (ডানে)। যশোরে সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে জমিলা খাতুন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ৪ নম্বর গ্যালারিতে নদী পথে মুক্তিযুদ্ধ সেকশনে এস এম সফির গ্রেনেড ভর্তি ঝুড়ি হাতে দুই তরুণীর আলোকচিত্রটি আগত দর্শণার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেও ছবিটি নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল এতো দিন। আলোকচিত্রে একাত্তর ফটো এ্যালবামে ছবিটির বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে– মুক্তিযোদ্ধা ও আলোকচিত্রী এস এম সফির স্ত্রী জমিলা খাতুন ও তার বান্ধবী মমতাজ বেগম গোসলের ছলে কচুরিপানার নিচে হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। শুধু এতটুকু তথ্য। ছবিটির বিষয়ে সন্দিগ্ধ সমালোচনা ছিল– হয়তো এটি আয়োজন করে তোলা! সম্প্রতি ৯ মে ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র কর্তৃক যশোর-খুলনা জেলায় অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী মুক্তিযোদ্ধা সাক্ষাৎকার সংগ্রহ কর্মসূচিতে এই আলোকচিত্রের নেপথ্যের ইতিহাস সংগ্রহ হয়েছে। যশোর শহরের লালদীঘির পাড়ে বসবাসকারি এস এম সফির স্ত্রী জমিলা খাতুন এবং সহযোদ্ধা শহরের নীলগঞ্জ তাতীপাড়ার বাসিন্দা মো: আব্দুর রহিম কালু ও শঙ্করপুরের বাসিন্দা শেখ শামীম উদ্দীন আন্দুর কাছ থেকে জানা গেছে বিস্তারিত ইতিহাস।

সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে– ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে যশোরে শুরু হওয়া প্রতিরোধ যুদ্ধে এস এম সফির নেতৃত্বাধিন ৬ সদস্যের একটি গেরিলা দল অংশ নেয়। দলটির অন্য সদস্যরা হলেন মুক্তিযোদ্ধা শেখ শামীম উদ্দীন আন্দু, কালু, কাউসার, জহির উদ্দীন তারা এবং মো: আব্দুর রহিম কালু। তারা প্রথমে পুলিশের থ্রি নট থ্রি বন্দুক এবং ইপিআরের কাছ থেকে গুলি সংগ্রহ করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। পরে এপ্রিল মাসের শুরুতে যশোরের রাজার হাটে অবস্থিত মাক্রোওয়েভ স্টেশন বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ভারত থেকে আগত ৭টি গ্রেনেডের ১টি সরবরাহ আসে এস এম সফির কাছে। সরবরাহকারীরা গ্রেনেডগুলোকে যশোরের ভৈরব নদীবর্তী বারান্দী এলাকার সাহাপাড়ায় অবস্থি একটি বাশঁঝাড়ে লুকিয়ে রেখে যায়। এস এম সফির গেরিলা দলটির অবস্থান ছিল নদীর ওপারে ঝুমঝুমপুরে। পাকবাহিনীর সহযোগী অবাঙালিদের চোখ এড়ানোর জন্য সফি নিজে না গিয়ে স্ত্রীকে পাঠান। সফির পরিকল্পনা অনুযায়ী এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে স্ত্রী নিয়ে গোসলের ছলে ডোঙ্গা নৌকায় করে গিয়ে গ্রেনেডগুলো সংগ্রহ করে। তারা বাঁশের বড় একটি ঝুড়িতে করে গ্রেনেডগুলেকে খড় দিয়ে পেঁচিয়ে এবং কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে নিয়ে যথা -যথ নিরাপত্তা বজায় রেখে অসীম সাহসিকতায় ঝুমঝুমপুরে ফিরে আসে। নদীর কিনারায় পানি কম ছিল বলে ডোঙ্গা নৌকা থেকে নেমে গ্রেনেড ভর্তি ঝুড়িটি হাতে নিয়ে পাড়ের দিকে এগিয়ে আসে যখন এই দুই নারী, তখন এস এম শফির ক্যামেরায় ছবিটি তোলা হয় পাড় থেকে।

দিনের দ্বিতীয়ার্ধে খুলনা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সদস্য দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একাত্তরের শরণার্থী ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকার দু’টি থেকে উঠে এসেছে তাদের দেখা একাত্তরের মার্চ-এপ্রিল মাসের খুলনা শহরের কথা, মে মাসে সংঘটিত চুকনগর গণহত্যার প্রেক্ষাপট, পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী জীবন এবং বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস।

নিষ্ঠুরতার স্মৃতির পরম্পরা

১ম-এর পৃষ্ঠার পর

মিরপুর এলাকার অবাঙালিরা এ খবর জানতো। একাত্তরের ১৯ এপ্রিল রাতের খাবার খেয়ে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ি। রাত আনুমানিক একটার দিকে পাক আর্মি ও বিহারিরা অতর্কিত হামলা করে আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে। বিহারিরা আমার বাবা মো: ইয়ার আলীকে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। কিছুক্ষণ পর তারা আমার চাচা মো: পিয়ার আলীকেও ডেকে নিয়ে যায়। এদিকে আমরা বাড়ির সবাই সারারাত বসে রইলাম তাঁদের ফেরার অপেক্ষায়। ভোর হতেই আমরা লোকমুখে শুনতে পেলাম, আমরা যদি বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি চলে না যাই তাহলে পাক-আর্মিরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। আমরা তখনও জানি না আমার বাবা এবং চাচা কী অবস্থায় আছে। আমরা নিজেদের প্রাণের ভয়ে সকাল হতেই সবাই বাড়ি ছেড়ে রায়েরবাজার গিয়ে আশ্রয় নেই। সেখানে আমাদের পরিচিত কেউ ছিলেন না। কিন্তু তখন সারা বাংলার মানুষ যেনো ছিলো একই পরিবারের, যেনো সকলে সকলের আত্মীয়। এরকম একটি অপরিচিত পরিবার আশ্রয় দেয় আমাদের। সেখানে দিন পনেরো থাকার পর আমরা চলে যাই জিগাতলা সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারে। সেই স্টাফ কোয়ার্টারটি ছিল একটি শরণার্থী শিবির। সেখানে আরও অনেক বাঙালি পরিবার আশ্রয় নেন। যুদ্ধের পুরো সময়টা আমরা সেখানেই ছিলাম। সে সময় আমার মা সখিনা খাতুন অন্তসত্তা ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে আমরা নিজ বাড়িতে আসতে পারিনি। কারণ আমার মা সখিনা খাতুনের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। কিছুদিন পরই জন্ম হয় আমার ছোট্ট একটা বোনের। নাম রাখা হয় সাজেদা। বোনের জন্মের কিছুদিন পর আমরা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে উঠি। কারণ সারা বাংলাদেশ ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হলেও মিরপুর এলাকা ছিল বিহারিদের দখলে। দেশ স্বাধীনের পর মিরপুরের অবস্থা শান্ত হলে আমরা নিজ বাড়িতে ফিরে আসি। তখনও আমরা জানি না যে বাবা ও চাচা কী অবস্থায় আছেন। আমরা অনেক খুঁজেও তাঁদের সন্ধান পাই নি। পরে আমরা এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানতে পারি এলাকার অনেকের সাথে আমার বাবা ও চাচাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। একই ছুরিতে না-কী বাবা ও চাচাকে হত্যা করেছিল বিহারিরা। এই খবর পেয়ে পরিবারের সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। আমার বাবা ও চাচার লাশের সন্ধান করতে গেলে স্থানীয় অনেকেই ধারণা করে বলেন যে, হয়তো পাক-সেনা ও বিহারিরা তাদের লাশ জল্লাদখানার কুয়াতে নিয়ে ফেলেছে। তাই জল্লাদখানায় আসলে মনে হয় আমার বাবা এখানে আছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অনেক ধন্যবাদ আমার বাবার শেষ স্মৃতিটুকু সংরক্ষণ করার জন্য। বাবা ও চাচার রোজগারে সংসার চলতো আমাদের। কিন্তু তারা মারা যাওয়ায় আমার মা সখিনা খাতুন অনেক কষ্টে আমাদের মানুষ করেছেন।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মো: শাহজামাল অশ্রুশিক্ত হয়ে পড়েন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে যত আন্দোলন হোক না কেন মহান মুক্তিযুদ্ধ একবারই হয়েছিল। আর এই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মূল ভিত্তি। তোমরা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে বাংলাদেশের কল্যাণে এগিয়ে যাবে তাহলেই ৩০ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে।

প্রমিলা বিশ্বাস

সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

নিয়মিত কর্মকাণ্ড : পেছনের কারিগর

সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উৎসব ও একুশে বইমেলা ২০২৫

৩০ জানুয়ারি ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইউনেস্কো ঘোষিত মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতিপ্রাপ্ত 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থপাঠ উৎসব। জাদুঘরের মিউজিয়াম ইন্টেরিয়র ও ডিজাইন টিমের প্রচেষ্টায় বহুমাত্রিক প্রদর্শনী ও মনোমুগ্ধকর সাজসজ্জা উৎসবকে জীবন্ত করে তোলে।

২০২৫-এ অনুষ্ঠিত 'অমর একুশে বইমেলা' সুলতানার স্বপ্ন অবারিত থিমের সাথে মিলিয়ে ডিজাইন করা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্টল। ডিসপ্লেতে নতুন মাত্রা আনতে প্রদর্শনীকে সরলীকরণের পাশাপাশি তারা অবলম্বন করে আকর্ষণীয় কৌশল।

বিশেষ প্রদর্শনী:

২৬ মার্চ ২০২৫ গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তিন দিনব্যাপী 'হিউম্যানিটি ইজ ওয়ান: দ্যা আনটোল্ড স্টোরি অব পল এন্ড এ্যলেন কনেট' বিষয়ক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে পল কনেট প্রদত্ত মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র, ডকুমেন্ট এবং পরবর্তীতে পল কনেটের বাংলাদেশ ভ্রমণের ছবি ও ভিডিও প্রদর্শিত হয়। কাজটি সম্পাদন করতে সর্বাত্মক সহায়তা করে জাদুঘরের মিউজিয়াম ইন্টেরিয়র ও ডিজাইন টিম।

প্রদর্শনী ও প্রস্তুতি কাজের কিছু মুহূর্ত দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে টিম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ

১ম পৃষ্ঠার পর

সামনে তখন মুক্তির কঠিন সময়। পরীক্ষার আগেই শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা ঝিনাইদহ শহরময় প্রচারণার মধ্য দিয়ে তাঁর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সূচনা। যদিও এর আগেই ক্যাডেট কোরে নেয়া হয়েছে অস্ত্রের প্রশিক্ষণও। অন্যদিকে রাজশাহীতে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর নেতৃত্বে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তুমুল প্রতিরোধ যুদ্ধ। সেসময় আহত কয়েকজন পাকিস্তান আর্মি রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসা নিতে এসে তাদের একজন মারা যায়। এ ঘটনার পর ডা. মো: মোজাহারউল হান্নান মেডিকেল কলেজ থেকে পালিয়ে রাজশাহীর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সেখান থেকে এক ফুফাতো ভাইকে নিয়ে বাড়িতে আসেন। অন্যদিকে ৩০ মার্চ গভীর রাতে ছাত্র, জনতা, পুলিশ ও ইপিআর মিলে কুষ্টিয়ায় অবস্থানরত পাকবাহিনীকে প্রতিহত করতে তাদের উপর আক্রমণ করে। কামালউজ্জামান তাতে যুক্ত হন। এসময় বেলুচ রেজিমেন্টের মেজর শোয়েব তার বাহিনী নিয়ে যশোরের দিকে পালানোর সময় কামালউজ্জামানদের পাতা ফাঁদে পরাস্ত হয়। ১ এপ্রিল সেনানিবাস থেকে পাক-আর্মির আরো একটি কনভয় আসলে প্রতিরোধের মুখে তারাও টিকতে পারেনি। এদিকে এপ্রিল মাসের ১০-১২ তারিখের দিকে মেহেরপুরের আমঝুপি গ্রামে পাক-আর্মিরা এসে হামলা এবং ধরপাকড় শুরু করলে ডা. মো: মোজাহারউল হান্নান পরিবার নিয়ে ধাড়িয়াপুর গ্রামে আত্মীয় বাড়িতে আশ্রয় নেন। অন্যদিকে ১২ এপ্রিল রাতে ১২ সদস্যের একটি সুইসাইডাল স্কোয়াড টিমের সাথে কামালউজ্জামান এসপি মাহবুব উদ্দিনের নির্দেশে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করে। ১৪ এপ্রিল পাকবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করলে ছত্রভঙ্গ হয়ে চুয়াডাঙ্গা চলে যায়। এদিকে জীবন বাঁচাতে পরিবার পরিজন দিয়ে ডা. মো: মোজাহারউল হান্নান ধাড়িয়াপুর নামক যে গ্রামে অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে বৈদ্যনাথতলা বেশি দূরে নয়। সীমন্তবর্তী এই এলাকায় তখনও পাকবাহিনী আসেনি। বেশ শান্ত ছিল পরিবেশ। অন্যদিকে কামালউজ্জামানদের দলকে ঝিনাইদহ অবস্থানকালে ১৬ এপ্রিল ক্যাপ্টেন খন্দকার একটি বিশেষ কাজে মেহেরপুর যেতে নির্দেশ দেন। কাজটি কী সে ব্যাপারে আগে থেকে কিছু জানানো হয়নি। পরদিন ভোরবেলা কামালউজ্জামান তার দলের সাথে বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে পৌঁছায়। এর মাঝে গ্রামের মধ্যে কানাঘোসা শোনা গেলো বৈদ্যনাথতলায় শেখ মুজিব আসছেন। দিনটি ছিল ১৭ এপ্রিল। তখন ডা. মো: মোজাহারউল হান্নান তার সমবয়সী কয়েকজনের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বৈদ্যনাথতলার দিকে গেলেন।

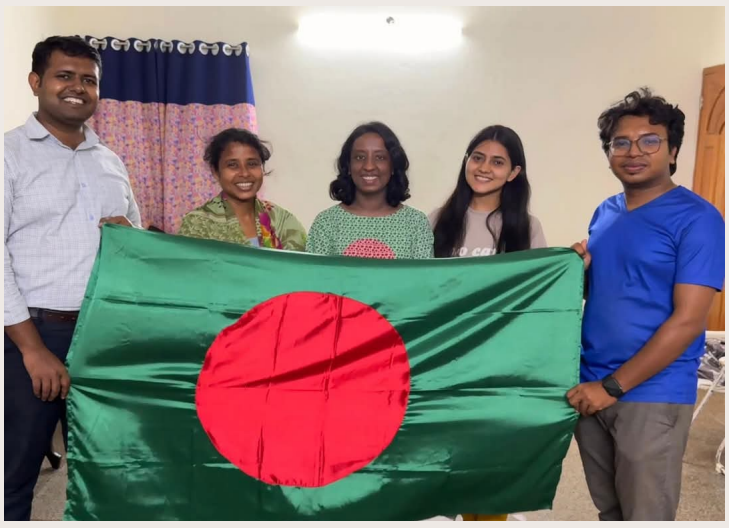

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মী ইয়াসমিন লিসার হিমালয় যাত্রা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মী ইয়াসমিন লিসা নতুন এক স্বপ্নের পথে যাত্রা শুরু করলো। Dream Above the Clouds:A Girl's Summit from Bangladesh শিরোনামে এই অভিযানে অভিযাত্রী ইয়াসমিন লিসা হিমালয়ের ৬৪৭৬ মিটার উচ্চতার মেরা পর্বত আরোহণের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। গত বছর সে হিমালয়ের কয়েকটি পর্বতশৃঙ্গে আরোহন করে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিযান ছিল বাংলাদেশের পাঁচজন নারীর শীতকালীন হিমালয় অভিযানে তিনটি পর্বত শৃঙ্গ জয়। এই অভিযানটি রোকেয়া সাখাওয়াৎ হেসেনের 'সুলতার স্বপ্ন' গ্রন্থ পাঠের অনুপ্রেরণায় 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' শিরোনামে হয়েছিলো। এই অভিযানের চার মাস পর ইয়াসমিন লিসা ৭ মে ২০২৫ মেরা পর্বত অভিযানে যাত্রা শুরু করলো।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার অভিযানের সাফল্য কামনা করে। তার জন্য রইলো অনেক শুভকামনা।

প্রামাণ্যচিত্র : পর্যালোচনা

স্বাধীনতা

একজন বীরাঙ্গনা নারীকে নিয়ে নির্মিত ইয়াসমিন কবির-এর 'স্বাধীনতা' এক হৃদয়স্পর্শী প্রামাণ্যচিত্রের নাম। মুক্তিযুদ্ধের একটি নির্দিষ্ট ঘটনার উপর নির্মিত হলেও বহুমাত্রিক দিক এখানে উঠে এসেছে। উঠে এসেছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বিশাল আত্মত্যাগের করুণ চিত্র। গুরুদাসী মন্ডল, যার জীবনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেদের সম্মান, সম্ভ্রম উৎসর্গ করা বাংলাদেশের বীরাঙ্গনাদের আত্মত্যাগ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুদাসী মন্ডল হারিয়েছেন তার স্বামী, সন্তান এবং সম্ভ্রম। নির্মমভাবে বন্দী ছিলেন রাজাকার ক্যাম্পে। এইসব কারণে হারিয়ে ফেলেছিলেন মানসিক ভারসাম্য। মানুষের সাথে হেসে হেসে কথা বলা গুরুদাসী নিজের ভিতরে বয়ে বেড়াচ্ছেন করুণ বেদনা। প্রামাণ্যচিত্রের পর্দায় ইয়াসমিন কবির যেটা তুলে ধরেছেন গভীর যত্ন ও দক্ষতার সাথে।

স্বাধীনতা প্রামাণ্যচিত্রে বীরাঙ্গনা গুরুদাসী মন্ডল

গুরুদাসী মন্ডল থাকেন পাইকগাছার দেলুটি ইউনিয়নের কপিলমুনী গ্রামে। এলাকাতে যিনি মাসী বলেই অধিক পরিচিত। মানুষের সাহায্যে চলে যার জীবন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে এখানে ওখানে, এর ওর কাছ থেকে জোর করে নিয়ে দিন যাপন করেন। কিছুদিন ছিলেন পাবনার মানসিক হাসপাতালেও। এসবের পিছনে আছে তার সাথে ঘটে যাওয়া এক নির্মম ঘটনা। ১৯৭১ সালে তার ছিল স্বামী আর ৪ সন্তানের সুখের সংসার। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে রাজাকাররা পাক বাহিনী নিয়ে হাজির হয় তার বাড়িতে। মুক্তিযোদ্ধাদের সে সাহায্য করে এই দোষ দেয় তার স্বামীকে। যার জন্য তার চোখের সামনেই হত্যা করা হয় তার স্বামীসহ সন্তানদের। সবথেকে ছোট ছেলেকে কাদার মধ্যে পুঁতে তারপর গুলি করে তার চোখের সামনে হত্যা করে তাকে নিয়ে যায় রাজাকার ক্যাম্পে। সেখানেও তার উপর চলে অমানুষিক নির্যাতন। সেখানেই বন্দী ছিলেন অনেকদিন। একসময় মুক্তিযোদ্ধারা তাকে উদ্ধার করলেও ফিরতে পারেননি স্বাভাবিক জীবনে। সেই থেকে যে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর এভাবেই চলছে। সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান তিনি। নেই কোন সহায় সম্বল। মৃত্যুর আগে পাননি বীরাঙ্গনার সম্মানও।

ইয়াসমিন কবিরের 'স্বাধীনতা' কেবল বাংলাদেশের একজন নারীর গল্প নয়। একই সাথে এটি শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নয় এটি বাংলাদেশের নারী ইতিহাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের দুই লক্ষ মা-বোনের গল্প। এটি বাংলাদেশের সকল বীরাঙ্গনার গল্প। যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিবার এবং সমাজ থেকে পেয়েছেন শুধু অবহেলা। শুধু অবহেলাই নয় অনেক সময় নিজের পরিবারও গ্রহণ করেনি তাদের। তাদের আত্মত্যাগকেও দেখা হতো ছোট করে। সেই সব নির্যাতনের শিকার, সম্মান হারানো, অবহেলিত নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন গুরুদাসী মন্ডল। যারা তাদের বুকের ভিতরে এক গভীর ক্ষত নিয়ে হেসে হেসে জীবন কাটাচ্ছেন।

খুব সহজভাবে নির্মিত এই প্রামাণ্যচিত্রে খুব বেশি সংলাপ না থাকলেও তা স্পর্শ করে গেছে মানুষের হৃদয়কে। কেননা, গল্প বলার মাঝে কোন নাটকীয়তা না করে অতি সাধারণভাবেই মানুষকে অনুভব করাতে পেরেছে গুরুদাসী মন্ডলের জীবন, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগকে। প্রামাণ্যচিত্রের চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং আবহসংগীত ছিল উপযুক্ত । বিশেষ করে গুরুদাসী এবং স্থানীয়দের সংলাপ এবং মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলা। তার সেই সহজ সরল জীবনকে কোনরকম নাট্যরূপ না দিয়ে বাস্তবের মত করেই করেছেন পরিচালক এবং চিত্রগ্রাহক। যা আরো বেশি হৃদয়স্পর্শী হয়েছে।

আমার মনে হয় 'স্বাধীনতা' প্রামাণ্যচিত্রটি আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত দরকারি ডকুমেন্ট। নয় মাসের যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তা কেবল আমাদের শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদ ছিলো না, ছিল আমাদের মুক্ত, স্বাধীন ভূখণ্ড এবং অধিকার আদায়ের লড়াই। এই প্রামাণ্যচিত্রে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি নারীদের যে মহৎ আত্মত্যাগ ও বলিদান তা আমরা জানতে পারি। সেই সাথে আমরা আমাদের বীরাঙ্গনা নারীদের যথাযোগ্য সম্মানের আসনে আসীন করার প্রয়াস পাই।

দ্বীপ হালদার
অডিও-ভিজ্যুয়াল সহকারী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাস ও গবেষণার প্রতি বরাবরই প্রবল আগ্রহ ছিল এবং বিদ্যমান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমার ইতিহাস চর্চায় এক অনন্য ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

আমানুল হাসান নাঈম
০২.০৫.২৫

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে আমার এই দেশের জন্ম, যার বীরত্বগাথা ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এ দেশে কখনো কাউকেউ মাথা নত করতে হবে না। মাথা উঁচু করে বিশ্ব দরবারে দাঁড়িয়ে রবে। নতুন প্রজন্মকে এই জাদুঘর পরিদর্শন করা উচত, অবশ্যই তারা বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ববোধ করবে এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে।

ইব্রাহিম খলিল

আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা আজ ভ্রমণ করলাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই স্বাধীনতা হঠাৎ করেই আসেনি। এর পেছনে রয়েছে বীর সেনাদের আত্মত্যাগ।

১৬.০৪.২৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করলাম আজ। জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। সত্যিই খুব হৃদয় বিদায়ক ইতিহাস। সম্পূর্ণ জাদুঘর পরিদর্শন করে মনে হলো যেন আমি ১৯৭১-এ অবস্থান করছি। চোখে জল আসার মতো অবস্থা আমার মধ্যে বিরাজ করছিল। এ অভিজ্ঞতা আমি কোনোদিন ভুলবো না। তাদের আত্মত্যাগের কথা আমি কোনদিন ভুলবো না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এটা দেখা এবং জানার সুযোগ পায়, এই প্রত্যাশা রাখব বাংলাদেশ সরকারের কাছে। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. আকাশ
শেরপুর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মনে হলো যেন পুরো বিষয়টা চোখের সামনে দেখতে পেলাম। মা যেন ফিরে গিয়েছিল তার সেই ছোটবেলার দুর্বিসহ অতীতে। পরিশেষে আমরাও সাক্ষী হয়ে থেকে গেলাম বাংলার ইতিহাসে।

পলি বিশ্বাস
১২.০৪.২০২৫

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যারা জীবন দিয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান। আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে দেশের স্বাধীনতার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ ও ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ। আমিও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য কাজ করব।

আব্দুল মান্নান
১২.০৪.২০২৫

মুক্তিযুদ্ধে স্মরণীয় অবদান

মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লাহ আবু মোতালেব

মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লাহ আবু মোতালেব ১৯৪৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি শেরপুরের গনই মমিনকান্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন, পরে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকবাহিনী ঢাকায় গণনিধনযজ্ঞ শুরু করলে সারা দেশের মতো শেরপুরেও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে মোতালেবের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। টাঙ্গাইল ও মধুপুর রণাঙ্গনের সাথে শেরপুর প্রতিরোধযোদ্ধা ও ভারতীয় বিএসএফ সদস্যদের সংযোগ সাধনে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। বর্বর পাকবাহিনী স্থানীয় প্রতিরোধ চূর্ণ করে শেরপুর প্রবেশ করলে মোতালেব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ডালু বাজারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শেরপুরের সিনেমা হল ছিল তাঁদের পারিবারিক মালিকানাধীন। তিনি জহির রায়হান পরিচালিত 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রের রিল নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেন।

উল্লেখ্য বড় ভাইকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতে রিলের অবস্থা জানতে চেয়ে মোতালেব লেখেন, 'ফিলিমের কি খবর'। শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করতে ভারতে শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হতো। এছাড়া 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক প্রদর্শনী থেকে অর্জিত অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হতো।

মোতালেব এবং তাঁর সহযোদ্ধারা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বেশকিছু দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। ২৫ মে ভোর সাড়ে চারটার দিকে পাকবাহিনী নাকোগাঁও ও ডালু বাজারের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ তিনি শত্রুবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়।

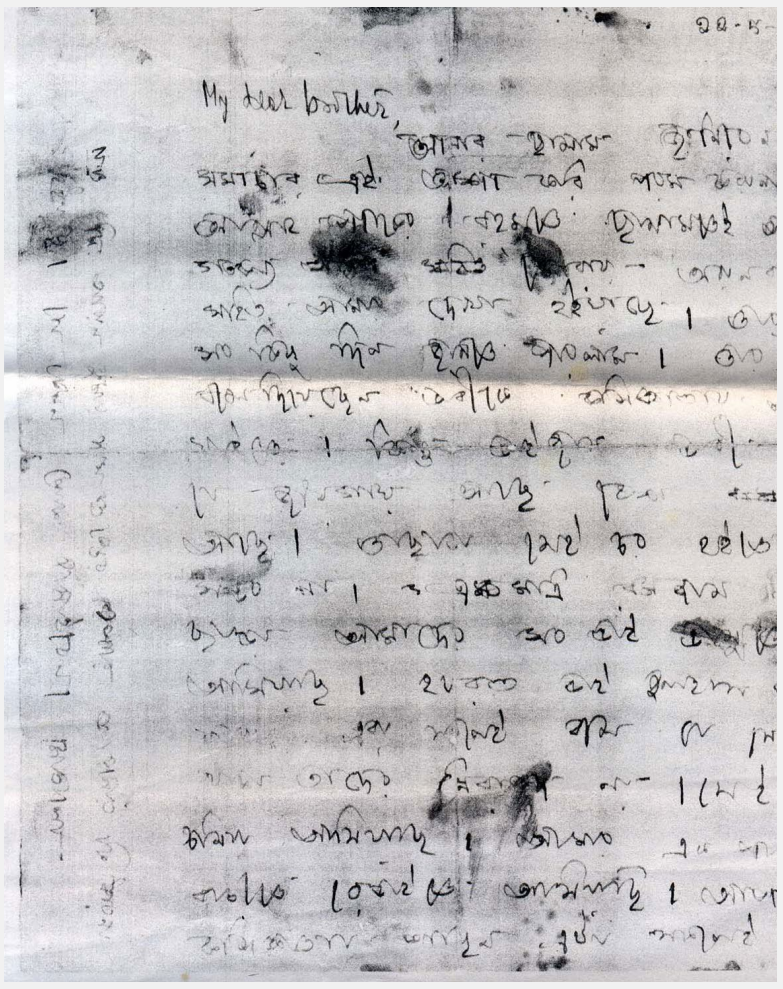

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লাহ আবু মোতালেব, বড় ভাইয়ের কাছে লেখা শহীদ মোতালেবের শেষ চিঠি

সহযোদ্ধাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধা সালেহ চৌধুরী (সাদা গোল চিহ্নিত)

মুক্তিযোদ্ধা সালেহ চৌধুরী

দৈনিক পাকিস্তানের সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। তিনি টেকেরহাট সাব-সেক্টর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার কাজে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। শাল্লা, দিরাই, জগন্নাথপুর, আজমিরীগঞ্জ, তাহিরপুরসহ বিশাল ভাটি এলাকায় যুদ্ধে অংশ নিয়ে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। সুনামগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা সালেহ চৌধুরীর আলোকচিত্র ও মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত দিক নির্ণয় যন্ত্র।

মুক্তিযোদ্ধা সালেহ চৌধুরীর ব্যবহৃত কম্পাস

সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধ : মে ১৯৭১

মে মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ক্রমে দেশের আরো ভেতরে প্রবেশ করে নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। নির্যাতিত মানুষেরা দলে দলে ভিটেমাটি ছেড়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। ভারত সরকার সীমান্ত খুলে দিয়ে শরণার্থীদের স্বাগত জানায়। প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নেয়। শরণার্থী আশ্রয় নেওয়ার সংবাদ গার্ডিয়ান, নিউইর্য়ক টাইমসসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

শোক পূর্ব পাকিস্তান: পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাকান্ড এবং দুর্ভিক্ষের প্রতিবাদে লাফায়েট পার্কে অ্যানা ব্রাউন টেলর, আব্দুল কাশেম এবং কোয়ানেটা গ্রিনো-এর প্রতিবাদ।

ওয়াশিংটন পোস্ট মে-১৫ ১৯৭১

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে বিভাগ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

Winter School Chronicles:A Journey to Remember

Can you live when the streets are in turmoil? Can a student study for exams in the absence of peace at home? Motivated by these questions, we participated in the 10th Annual Winter School, titled "Reimagining Peace Education in a Changing World of Atrocities." that held from 20th February to 27th February, 2025. We, law students, have spent the last few years reading legal doctrines and studying cases but the inherent significance of peace and its impact on every single sector of society is often understated and rarely emphasized. This program was a great chance to fill that and learn about how peace education can contribute to the creation of a just world.

The program was filled with various academic and practical activities such as seminars, workshops, panel discussions, group discussions, case studies, team works, presentations, field visits, and research reports. A pivotal point was the Declaration of Intent, in which participants expressed a commitment to peace in their own communities. We loved the theological reflections on historical memory and its role in creating a peaceful future that were present in the story from the very beginning. The workshops focused on interactive learning, with experienced teachers and young students exploring peacebuilding through narrative, art and hands-on activities.

The topics covered ranged from the plight of the Rohingya refugees to the meaning of the July Uprising in Bangladesh. How leaders have contributed through the history of Bangladesh's formation and the significance of history-vision clarified-peace education. A break down including a walk through the attires and photos of old to new a walk… We must try and learn from our previous experiences of the war, helping educate the audience on the causes, effects and current peace theory and effectiveness. The sessions highlighted a vital need to place peace education in the policy making to respond to contemporary global conflicts.

Sultana's Dream, a feminist utopian novel written in 1910, was among the many readings that challenged us to think; its themes continue to resonate today in the discussions on gender equality and women's empowerment. The discussions reflected this and how its ideas can inform today's policies and the roles of women in society.

Hearings about her courage while growing up, when Nishat Mazumdar our beloved Respected mam told "Nepal is my second home" was one of the proudest and emotional moment for us.

Our major/key takeaways of the winter school programs were:

The Kumudini Complex: A Ray of Hope in Times of Uncertainty and Resilience
Engaging Learning: A Dynamic Approach to Peace
Honouring Justice: The Power of Remembrance
Field Trips as a modality for Witnessing Peace in Practice
Digital Challenges to Peace
Commemorating Leadership and Bravery
A Renewed Pledge for Peace
Pioneers Unite for an Unforgettable Event
Redefined notion of Peace from broader perspective

We have become a community of change-makers, and as we reminisce over this transformative journey, we move ahead with a fresh vigour and sense of responsibility. Not only has Winter School expanded our academic insights and thinking but has prepared us into a higher level of awareness of our roles as umbrellas that must spread out over society and defend peace. What they've experienced and learned will surely inform our work toward advancing peace and justice in our own communities and beyond.

It was a journey that was not just academic but a clarion call that peace is not a goal but a prerequisite to our evolution and collective survival.

Sweekriti Dangi & Prashanna Devkota
Kathmandu, Nepal

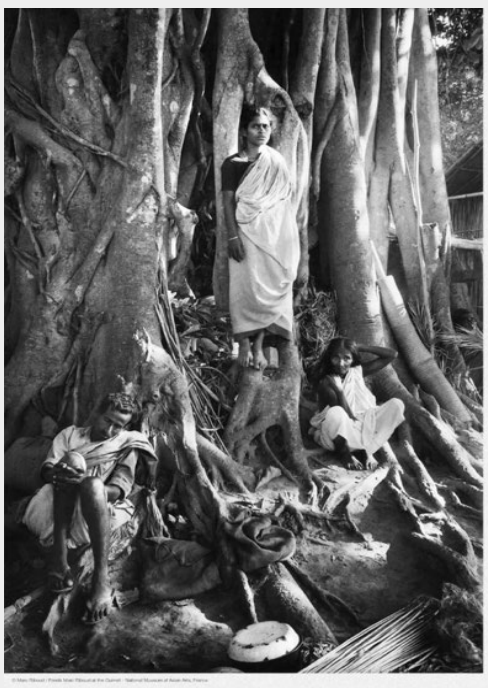

১৫ থেকে ২৯ মার্চ কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি ও অঁলিয়াস ফ্রসেস ডি বেঙ্গল আয়োজান করে Kolkata to Dhaka, 1971 : Marc Ribound's Lens on History *(A Photographic Chronicle of Humanity, Resilience, and Liberation)* শিরোনামে ছবির প্রদর্শনী। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে এই প্রদর্শনীর সহআয়োজক হিসেবে ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

আগামীর আয়োজন

সুলতানার স্বপ্ন বিষয়ক কর্মশালা:
রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের বিভিন্ন রচনা স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে স্থান পেয়েছে। আরও কার্যকরভাবে রোকেয়া এবং সুলতানার স্বপ্নকে উপস্থাপনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ১৭, ২১ এবং ২৩ মে তিন দিন কর্মশালার আয়োজন করেছে। এই আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশী হিসেবে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যায় এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়।

সনদ এবং পুরস্কার বিতরণ:
২৪ মে ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুপাঠ উদ্যোগের সনদ এবং পুরস্কার বিতরণ।

২৬ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসের অনুষ্ঠান:
আঠার মে পৃথিবীব্যাপী পালিত হয়ে আসছে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দিবসটি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ (আইকম), বাংলাদেশের সাথে যৌথ আয়োজনে আগামী ২৬ মে ২০০২৫, সোমবার, বিকেল পাঁচটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেমিনার হলে আয়োজন করেছে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান। এ বছর জাদুঘর দিবসের প্রতিপাদ্য 'দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে জাদুঘরের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। আইকম বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official